সংবাদ সম্মেলনের অবস্থান পত্র, ১১ মে ২০২৬, কক্সবাজার

কক্সবাজারে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে

স্থানীয় সরকার ও জনগনের অংশগ্রহণ জরুরি

১. পটভূমি: কক্সবাজারে ১৩ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার উপস্থিতি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এবং দীর্ঘস্থায়ী মানবিক সংকট হিসেবে বিবেচিত। ২০১৭ সালে এই সংকটের শুরু থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সংস্থাসমূহ ছিল প্রথম সাড়াদানকারী। পরে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও, এবং জাতিসংঘ সংস্থাগুলো রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু কিছু সমস্যা দিনদিন আরো প্রকট হচ্ছে। যার সমাধান করা খুবই জরুরি।

২. **৩০০ একর কৃষিজমি পুনরুদ্ধার:** উখিয়া ও টেকনাফে রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন প্রায় ৩০০ একর কৃষিজমি ক্যাম্পের বর্জ্যের কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। বিপুল পরিমাণ মানবিক সহায়তা ব্যয়ের পরও এই জমি পুনরুদ্ধার বা টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি, যা স্থানীয় জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত। বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক কারণ কক্সবাজার জেলা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও ক্ষুধার সূচকে দেশের দ্বিতীয় ঝুঁকিপূর্ণ জেলা হিসেবে বিবেচিত। জেলার অর্থনীতি ও মানুষের জীবনধারা মূলত বন, কৃষি, ধান চাষ ও লবণ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে কক্সবাজারে টেকসই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. **ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমানো:** বিশেষ করে উখিয়ায় প্রায় ৫-১০% টিউবওয়েল হয়ত শুকিয়ে গেছে, নয়তো লবণাক্ত পানি আসছে। বর্তমানে উখিয়া ও টেকনাফে রোহিঙ্গাদের জন্য প্রতিদিন প্রায় ২ কোটি ৬০ লাখ লিটার ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। কিন্তু ঈঈঘঋ দীর্ঘদিন ধরে ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে নাফ নদীর পানি পরিশোধনের মাধ্যমে ব্যবহারের দাবি জানিয়ে আসছে। বিকল্প পানির উৎস তৈরি এবং পুকুর খননের মাধ্যমে ভূগর্ভে পানি পুনঃসংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. **সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:** আমরা দেখেছি, কক্সবাজারে সীমান্ত নিরাপত্তা অত্যন্ত দুর্বল। গত কয়েক বছরে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণ ও এনজিওসমূহ দীর্ঘদিন ধরে শক্তিশালী সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছে, যাতে স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিজিবির সক্ষমতা বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত সীমান্তরক্ষী মোতায়েন, সীমান্তে বেড়া নির্মাণ এবং নাফ নদীতে শক্তিশালী নৌ টহল নিশ্চিত করার মাধ্যমে সরকারকে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।

৬. **স্থায়ী আশ্রয় নির্মাণের সিদ্ধান্তে স্থানীয় সরকার ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরামর্শ নিশ্চিত করতে হবে:** জমি ও স্থানীয় স্বার্থের প্রশ্নে জেলা প্রশাসন, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবসান কমিশনার, বন বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করা স্থানীয় জনগণের ন্যায্য অধিকার। বিশ্বব্যাপী শরণার্থী সংকট ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী অবকাঠামো খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু রোহিঙ্গা সংকটে আমরা স্থায়ী ধরনের স্থাপনা নির্মাণ হতে দেখছি। আমরা মনে করি, এটি সামগ্রিক মানবিক সংকট ব্যবস্থাপনায় একটি নেতিবাচক দৃষ্টান্ত তৈরি করবে এবং আশ্রয়দাতা দেশে স্থায়ী বসবাসের প্রবণতা সৃষ্টি করবে। একই সঙ্গে, যে দেশ এই শরণার্থী সংকটের জন্য দায়ী, তাদের প্রত্যাবাসনের দায়বদ্ধতাও কমে যেতে পারে। সম্প্রতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব কক্সবাজার ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন এবং সেখানে আশ্রয় নির্মাণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু সেই আলোচনায় কেবল

সীমিতসংখ্যক জাতিসংঘ সংস্থা, আইএনজিও ও এনজিও অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। স্থানীয় এনজিও, সিএসও, ঈঈঘঋ প্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার

শগ্রহণের সুযোগ ছিল না। এছাড়া আশ্রয় নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণ পরিবেশবান্ধব নয় (যেমন প্লাস্টিক ত্রিপল) এবং অন্যান্য উপকরণও স্থায়ী ধরনের, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো স্বচ্ছতা বা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা করা হয়নি। আমরা শুনেছি নির্মাণকাজে ওহভরহরী নামের একটি কোম্পানি কাজ করছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের বিষয়ে আরআরআরসি, বন বিভাগ ও স্থানীয় সরকারের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি। এটি কি বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়?

৭. **UN OCHA-এর অর্থায়ন সরাসরি স্থানীয় এনজিওদের কেন নয়:** তহবিল সংগ্রহে জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর সক্ষমতা ও উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। সম্প্রতি টঘঙঈঐঅ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে রোহিঙ্গা মানবিক সহায়তার জন্য ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ পেয়েছে। এর মধ্যে ৯২% অর্থ গেছে জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর কাছে এবং ৮% গেছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে, কিন্তু স্থানীয় এনজিওদের সরাসরি কোনো অর্থায়ন করা হয়নি, যা তাদের স্থানীয়করণ অঙ্গীকারের পরিপন্থী। আমরা সম্মানপূর্বক দাতাদের প্রতি আহ্বান জানাই, তারা যেন স্থানীয় এনজিওদের সরাসরি অর্থায়ন করে। এছাড়া এই অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো উন্মুক্ত দরপত্র বা তথ্য প্রকাশ করা হয়নি, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করে।

৮. **পুলড ফান্ড স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং স্থানীয় এনজিওদের জন্য হতে হবে:** ব্র্যাক রোহিঙ্গা প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় সংগঠনগুলোর জন্য একটি পুলড ফান্ড পরিচালনা করছে। কিন্তু আমরা দেখেছি, এই ফান্ডের অধিকাংশ অংশীদার জাতীয় এনজিও, যারা কক্সবাজারের স্থানীয় সংগঠন নয়। তথ্য অনুযায়ী, ফান্ড গ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ২২% স্থানীয় এনজিও (৬টি সংগঠন) এবং ৭৮% জাতীয় এনজিও (২১টি সংগঠন)। এই পুলড ফান্ড স্থানীয় এনজিও কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত।

৯. **পুলড ফান্ডের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন:** এই পুলড ফান্ডের বিপুল অর্থ সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির নামে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় ব্যয় হয়েছে, যার প্রায় ৪০-৫০% ব্র্যাকের কাছেই থেকে গেছে বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এত উদ্যোগের পরও স্থানীয় কোনো এনজিও এখনো কোনো সেক্টর বা ক্লাস্টারের নেতৃত্ব নিতে পারেনি। CCNF ও স্থানীয় এনজিওসমূহ বিশ্বাস করে যে সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। বর্তমানে রোহিঙ্গা সাড়াদানে ১১৭টি এনজিও কাজ করছে। এর মধ্যে ৮-৯টি জাতিসংঘ সংস্থা, ৫০-৫৫টি আইএনজিও, ৮-১০টি স্থানীয় এনজিও এবং বাকিগুলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগঠন। আমাদের দাবি হলোড়আরও বেশি স্থানীয় এনজিওকে যুক্ত করতে হবে এবং স্থানীয়করণের প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে অর্থায়ন ও দক্ষতা হস্তান্তরের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. **জাতিসংঘ সংস্থা ও আইএনজিওদের সরাসরি বাস্তবায়ন বন্ধ করতে হবে:** জাতিসংঘ সংস্থা ও আইএনজিওগুলোর তহবিল সংগ্রহ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও মনিটরিং সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় এনজিওদের সহায়তা করার পরিবর্তে কিছু জাতিসংঘ সংস্থা (IOM, UNHCR) এবং আইএনজিও (Tdh, ActionAid, ACTED) সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আমরা জানি, তাদের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন ব্যয় স্থানীয় এনজিওদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই আমাদের আহ্বানড়জাতিসংঘ সংস্থা ও আইএনজিওগুলো স্থানীয় এনজিওদের অংশীদার হিসেবে নিয়ে কাজ করবে এবং তাদের ভূমিকা হবে তহবিল সংগ্রহ, কারিগরি সহায়তা ও মনিটরিং প্রদান। জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর সরাসরি বাস্তবায়নে যাওয়া উচিত নয়।

১১. **জাতিসংঘ সংস্থাগুলোকে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের কাছেও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে:** শুরু থেকেই জাতিসংঘ সংস্থাগুলো স্থানীয় বা জেলা প্রশাসনের কাছে জবাবদিহিতার আওতায় ছিল না। অথচ তা থাকা

উচিত। আমরা ইন্দোনেশিয়া ও নেপালে দেখেছি, সেখানে সব জাতিসংঘ সংস্থা স্থানীয় ও জাতীয় সরকার উভয়ের কাছেই জবাবদিহিতার আওতায় থাকে। সরকারের যথাযথ অনুমতি ছাড়া তারা কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে না। আমরা বলতে চাইছি কেউ জবাবদিহিতার উর্ধ্বে নয়। বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম দেশ, তাই সব সংস্থাকেই বাংলাদেশ সরকারের কাছে জবাবদিহিতার আওতায় থাকতে হবে।

১২. **দুটি প্রতিষ্ঠানের হাতে তহবিল কেন্দ্রীভূত হওয়া ও একচেটিয়াকরণ:** সাম্প্রতিক সময়ে CCNF ও স্থানীয় এনজিওসমূহ লক্ষ্য করেছে যে অধিকাংশ তহবিল একটি জাতীয় পর্যায়ের আইএনজিও এবং কক্সবাজারের একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এ নিয়ে স্থানীয় গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এটি মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে এক ধরনের একচেটিয়া প্রভাব তৈরি করছে। তহবিল বন্টন আরও ন্যায্য, সমতাভিত্তিক ও স্থানীয় অংশীজনদের মধ্যে বন্টিত হওয়া উচিত।

১৩. **কেন একটি নির্দিষ্ট দেশের এত বেশি প্রবাসী কর্মকর্তা এখানে কাজ করেন:** কক্সবাজারে কর্মরত অনেক আইএনজিও ও জাতিসংঘ সংস্থায় দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা একটি নির্দিষ্ট দেশের নাগরিক। আমরা মনে করি, এটি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগের বিষয়। তাই আমরা বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানাই যে, এসব গুরুত্বপূর্ণ পদে বাংলাদেশিদের নিয়োগ নিশ্চিত করা হোক এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার বিষয়গুলো সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হোক।

১৪. **রোহিঙ্গা কো-অর্ডিনেশন টিম (RCT)-এ স্থানীয় সরকার ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে:** বর্তমানে ৭টি সংস্থার অংশগ্রহণে RCT গঠিত হয়েছে, যেখানে ২টি স্থানীয়, ২টি জাতীয় এবং ২টি আন্তর্জাতিক সংস্থা রয়েছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই সমন্বয় কাঠামোতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের কোনো অন্তর্ভুক্তি নেই। ফলে অনেক সিদ্ধান্ত মূলত জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর স্বার্থ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে, কারণ তারাই এই কাঠামোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। CCNF জোরালোভাবে দাবি জানায় যে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, বিশেষ করে সংসদ সদস্যদের (MPs) এই সমন্বয় কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে কক্সবাজারের জনগণের স্বার্থ ও উদ্বেগ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।

১৫. **রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কমিশন গঠন:** বর্তমানে কক্সবাজারে ১৩ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী অবস্থান করছে। গত দুই বছরে আরও ২ লক্ষাধিক নতুন শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রত্যাবাসনের পরিবর্তে শরণার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, যা দেশের ওপর একটি বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে কক্সবাজারের মানুষ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় দৃশ্যমান অগ্রগতির অভাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এখন পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট রোডম্যাপ দেখা যায়নি। এ প্রেক্ষাপটে CCNF একটি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কমিশন গঠনের দাবি জানাচ্ছে, যা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার জন্য জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে এবং স্থানীয় জনগণের কাছে অগ্রগতি ও হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করবে।

১৬. **রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে আগতদের স্থানীয় এনজিও ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত:** আমরা স্পষ্টভাবে বুঝি যে দর্শনার্থীরা একটি উদ্দেশ্য নিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। তারা রোহিঙ্গাদের কথা শোনেন, কিন্তু স্থানীয় এনজিও ও জনপ্রতিনিধিদের মতামত শোনেন না। অথচ এই সংকটে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী স্থানীয় জনগণ। তাই তাদের কণ্ঠস্বরও শোনা জরুরি। স্থানীয় মানুষই তাদের এলাকার সর্বোত্তম স্বার্থ সম্পর্কে জানে। ফলে যেকোনো সিদ্ধান্ত স্থানীয় এনজিও ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা উচিত।

১৭. **রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা:** কক্সবাজার জেলার অনেক মানবিক কর্মী ইতোমধ্যে চাকরি হারিয়েছেন। স্থানীয় জনগণের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে যে জেলার বাইরের মানুষদের তুলনায় স্থানীয়রা বেশি কর্মসংস্থান হারাচ্ছে। তাই নিয়োগ ও চাকরির ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৮. **সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্ল্যাটফর্মে স্থানীয় এনজিওদের অংশগ্রহণ নেই:** আমরা লক্ষ্য করছি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন ফোরাম ও প্ল্যাটফর্ম স্থানীয় এনজিওদের সম্পৃক্ত করতে খুব কম আগ্রহ দেখায়। এ ধরনের বৈঠক বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার তথ্যও খুব কম প্রচার বা প্রকাশ করা হয়, যেখানে মূলত জাতিসংঘ সংস্থা ও সরকারি প্রতিনিধিরাই অংশ নেয়। সম্প্রতি ক্যাম্পে দুইতলা আবাসন নির্মাণের বিষয়টি কোনো এনজিও বা জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। আমরা আশঙ্কা করছি স্থানীয় এনজিও ও জনপ্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে কি না। আমরা এ ধরনের আচরণের তীব্র বিরোধিতা করছি।

১৯. **হোস্ট কমিউনিটির জন্য বরাদ্দ ২৫% অর্থের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে:** দীর্ঘমেয়াদি রোহিঙ্গা সংকটের কারণে কক্সবাজারের হোস্ট কমিউনিটি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত চাপের মুখে রয়েছে। তাই হোস্ট কমিউনিটির জন্য কথিত ২৫% বরাদ্দের বিষয়ে অধিক স্বচ্ছতা প্রয়োজন। এই বরাদ্দের ভিত্তি কী, কোথায় ব্যয় হচ্ছে, কোন খাতে ব্যবহার হচ্ছে, কোন সংস্থা বাস্তবায়ন করছে এবং কীভাবে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে এসব তথ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে। এতে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও স্থানীয় জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে।